পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা : কাঙাল হরিনাথ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

'আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি।
আমি ডিমে এলেম, ডিমে রলেম, হোতে নারিলাম পাখী'

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের সতেরোই জুন কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাঠকক্ষে 'হরিনাথ গ্রন্থাবলী'তে এই পংক্তি পড়ে চমকে উঠেছিলাম। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র দুঃসাহসী সম্পাদক, প্রপীড়িত কৃষকদের বন্ধু এবং একান্ত আপনজন, অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধা হরিনাথ মজুমদারের অতি পরিচিত এই রূপের পাশাপাশি তাঁর এই নিদারুণ আকুতি, আর্তি এবং আততির পরিচায়ক এই গানের প্রথম ছত্রদুটি স্বভাবতই আমার বিস্ময়ের সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

উনিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক আন্দোলনের অক্লান্ত সৈনিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়িতে অখিলদ্দিনকে ডেকে এনে তাঁর মুখে একটি গান বারবার শুনতেন এবং এই গান শোনাবার জন্য তাঁকে পারিশ্রমিক হিসেবে পয়সা দিতেন। সেই গানটির কয়েকটি পংক্তি হলো,

কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নির্ণয় কর্বে রে কে,
তুমি কোনখানে খাও কোথাও থাকরে, মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ—
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চড়নদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি
আপনি হও যে হাইল বৈঠা। ...

সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা যোদ্ধা বিদ্যাসাগর যখন তাঁর বাড়িতে অখিলদ্দিনকে ডেকে এনে এই গানটি বারবার

শুনতেন এবং অশ্রুপাত করতেন তখন বোঝাই যায় যে এই সংগ্রামী মানুষটির কঠিন কঠোর মনের ভেতরে একটি নরম এবং আবেগী মনও নিভৃতে বাসা বেঁধে বসে আছে। আসলে এই নিভৃতে বাসা বেঁধে বসে থাকা মন প্রায় সবার মধ্যেই আছে। সঙ্গ-নিঃসঙ্গের এক আলোছায়ার মধ্যে এই নিভৃত মনন এক অন্য দর্শনের পিয়াসী। এই দর্শন বস্তুগত দর্শনের আপাত বিরোধী মনে হলেও আসলে তা নয়। আমি থেকে আমরা হওয়ার প্রক্রিয়ায় এই মনন অত্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। হরিনাথ মজুমদার তো তার 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' নিয়ে মানুষের মধ্যে গিয়েছিলেন সংগ্রামের বার্তাবাহক হয়ে। আবার উত্তরকালে তিনিই তাঁর ফিকিরচাঁদের গানের দল নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষের মধ্যে গিয়ে তাঁদের সান্নিধ্যেই স্বস্তি খুঁজেছেন। তিনি তো আর পলায়নবাদী হন নি। বিদ্যাসাগরও তো তাই। তিনি অখিলদ্দিনের গান শুনেছেন, চোখের জল ফেলেছেন আবার তারপরই লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার লড়াকু সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাম বসুর গান পছন্দ করতেন এবং গাইতেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সপ্তাহে যে তারিখে প্রকাশিত হতো তার আগের রাতে প্রেসে পত্রিকার প্রিন্ট-অর্ডার দিয়ে হরিশচন্দ্র রাম বসুর যে গানটি আপন মনে গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরতেন, সেই গানটি হল,

বুঝি শ্যাম এলো গোকুলে সখি,
সুধাও দেখি কোকিলে কি বলে।
এতদিন নীরবে ছিল, আজ কিসে আনন্দ হল,
পঞ্চস্বরে ডাকে কোকিল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।...

হরিশচন্দ্রের হৃদয়ের যে আকুতি এই গানে প্রকাশ পেয়েছে তা বাস্তবিক পেট্রিয়ট —সম্পাদক হরিশচন্দ্রের মুখে খানিকটা বিসদৃশ মনে হতে পারে। আসলে আগেই যে কথাটা বলতে চেয়েছি, মানুষের মনের মধ্যে আর একটা মন নিভৃতে বাসা বেঁধে বসে আছে যে হরেক ফুলের বাগানের এক কোণে বসে ভায়োলিন বাজায়, বাগানের বাইরে সে যায়না।

বিদ্যাসাগর বাউল গায়ককে বাড়ি ডেকে এনে তার গান শুনতেন, হরিশচন্দ্র রাতে বাড়ি ফেরার পথে আপন মনে রাম বসুর গান গাইতেন আর হরিনাথ মজুমদার নিজে গান লিখতেন, গাইতেন এবং গানের দল গড়ে গ্রামে গ্রামে মানুষের দরবারে হাজির হতেন।

২

লালন ফকিরের গান, গগন হরকরার গান, পাগলা কানাইয়ের গান কিংবা রজনীকান্তের গান, অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত এগুলো কিন্তু সবই ব্যক্তিক সংগীতের সূচক। কিন্তু ব্রহ্মসংগীত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির

একক সংগীত নয়। বহু গীতিকার ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন এবং তা ব্রহ্মসংগীত হিসেবে গীত ও পরিচিত হয়েছে। উনিশ শতকে এইরকম দলীয় পরিচিতিকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। তাঁর ফিকিরচাঁদের গানের দলে গীত সব গানই তাঁর রচিত নয়। হরিনাথ ব্যক্তিক পরিচিতিকে সামনে আনতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। সম্মিলিত প্রয়াসকেই তিনি তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় প্রকাশিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি একটি লেখা শুরু করে অসুস্থতার জন্যে আর লিখতে পারছিলেন না। তখন তিনি তাঁর পত্রিকায় রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে সেই লেখাকে সম্পূর্ণতাদানের প্রস্তাব রেখেছিলেন। অর্থাৎ রচনার যৌথতার প্রতি তিনি দিলখোলা সমর্থন রেখে উনিশ শতকে এক বিরল নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। তাঁর গানের দলেও অন্য অনেকের গান তিনি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে তাঁকে নিজের নামাঙ্কিত নয়, দলীয় পরিচয়ে পরিচিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে লালনের প্রভাবেই হরিনাথ তাঁর গানের দল গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে এই উদ্যোগ আবার তাঁর নিজের হাতে ভ্রূণের চেহারায় আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি। 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে' লালনের এই গানটি কাঙাল-শিষ্য এবং উত্তরকালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কেই সর্বপ্রথম নাড়া দেয়। এই গানটি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের সূচনাপর্বে হরিনাথের বাড়িতে প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন সহ গ্রামবার্তার প্রেসের কর্মচারিদের সামনে স্বয়ং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ই সর্বপ্রথম একটি বাউলদল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। হরিনাথ তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে সবাই অক্ষয়কুমারের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু বাউলদল গড়তে গেলে তো নতুন গান দরকার। অক্ষয়কুমার নিজেই সেই দায়িত্ব নিয়ে তাৎক্ষণিক আবেগে একটি গান রচনা করেন। গানটি এই রকম,

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে
ছোঁবে না রে সোনা দানা।...

এভাবে গান রচনার পর প্রথামত গানের শেষে ভণিতা দেওয়ার কথা উঠলে অক্ষয়কুমার গানের ভণিতা হিসেবে 'ফিকিরচাঁদ' নামটি ব্যবহার করে লেখেন,

ফিকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই
মিছামিছি পর ভাবনা
চল যাই সত্যপথে, কোন মতে
এ যাতনা আর রবে না।

হরিনাথের জীবনীকার জলধর সেন এই ফিকিরচাঁদের দলের অন্যতম সদস্য হিসেবেই জানিয়েছিলেন যে এই দল গঠনের মধ্যে কোনও 'ধর্ম্মভাব' ছিল না বরং কোনও 'ফিকিরে' সময় কাটানোই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। আর এটাই হলো 'ফিকিরচাঁদ' নামের 'ইতিহাস'। অক্ষয়কুমারের এই নবরচিত গানে সুরারোপ করেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর হরিনাথ বাড়ি ফিরলে তাঁকে এই গান সবাই মিলে গেয়ে শোনান। এই গানে হরিনাথ অভিভূত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাউলদল গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। একই সঙ্গে হরিনাথ নিজেই দলের দ্বিতীয় গান রচনা করেন। গানটি এইরকম,

আমি করব এ রাখালী কতকাল।
পালের ছটা গোরু ছুটে করছে আমায় হাল-বেহাল...

আর গানের শেষে 'কাঙাল' ভণিতা ব্যবহার করে লেখেন,

কাঙাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে
তোমার রাখালী নেও আর পারিনা গোরু চরাতে
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে,
তাই কর দীনদয়াল।

এইভাবে 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' নামের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয়। এখানে কাঙাল শব্দটি ভিক্ষাবৃত্তির সমার্থক নয় বরং এই শব্দের অন্তর্তরঙ্গে নিবেদনের ধ্বনির অনুরণন অনুভূত হয়। হরিনাথের আর এক সাহিত্যশিষ্য দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন এই 'কাঙাল' অভিধা সাধারণ্যে 'মহর্ষি' কিংবা 'রাজর্ষি' খেতাবের চাইতে কম-গৌরবের কিছু নয়। হরিনাথের এই স্বগৃহীত 'কাঙাল' অভিধা আমাদের দেশে অগৌরবের কিছু নয় বরং এই 'কাঙাল' আমাদের দেশের 'শ্মশানেশ্বর পশুপতি'।— এ বক্তব্য দীনেন্দ্রকুমারের। তবে দীনেন্দ্রকুমার হরিনাথের স্বগৃহীত এই কাঙাল শব্দটিকে মহর্ষি কিংবা রাজর্ষি শব্দের সঙ্গে তুলনা করে খানিকটা আবেগের দাসত্ব করেছেন, যুক্তির অধীনতা স্বীকার করেন নি। হরিনাথ সারাজীবনই কাঙালের অর্থাৎ দরিদ্রের জীবনযাপন করে গিয়েছেন, দারিদ্র্য তাঁর জীবনে নিত্যসঙ্গী ছিল। তাছাড়া শৈশবে মাকে হারিয়ে তিনি মায়ের অনুপস্থিতি সারাজীবন অনুভব করেছেন এবং মায়ের আদরের জন্য কাঙালিপনা করেছেন। এইসব অভাব ও আকাঙ্ক্ষাজনিত চিন্তাভাবনা থেকেই হরিনাথ এই কাঙাল অভিধা নিয়েছিলেন। মায়ের জন্য তাঁর আকুতি কোনদিনই অবসৃত হয়নি। তাঁর জীবনের শেষ রচনা 'মাতৃমহিমা'য় তিনি লিখেছেন,

মাগো, নিজমুখে আমার নাম রেখে হরি,
শিশুকালে আমায় গেলে পরিহরি;
মাগো, তার পরে পিতা, হরিলেন বিধাতা
দুঃখের কথা স্মরি ভাসি নয়ন জলে।

এই দুঃখবোধ তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাবিন্যাসের পটভূমি রচনা করেছিল। জীবন সংগ্রামের খরতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে মায়ের স্নেহাশ্রয়ের অভাববোধ তাঁকে বারম্বার মাতৃসাধনার চিন্তাশ্রয়িতায় নিয়ে এসেছিল। গ্রামবার্তা থেকে অবসর নিয়ে তিনি ক্রমশই সাধনভজনের দিকে অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে পড়েন। তিনি বলতেন, 'আমি বাবা মা বলিয়ে ভূতলে লোটায়ে, খেলা করি যুগল চরণকমলে'— আর এটাই ছিল তাঁর সাধন ভজনের মুল দিক। তাঁর এই মাতা পিতার চিন্তাবিন্যাস তাঁর সাধনসংগীতের স্তরে রাধা-কৃষ্ণ, শ্যাম-শ্যামা, ব্রহ্মময়ী-পরমপিতা প্রভৃতির রূপগ্রাহিতায় অন্যরূপে বিকাশলাভ করেছিল। আর লালনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশ সহজতর হয়েছিল।

তবে একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। হরিনাথ লালনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করলেও, তাঁর গান ও দলের অনুপ্রেরণায় বাউলগানের দল গঠন করলেও হরিনাথ কিন্তু সাধক বাউল ছিলেন না। তিনি গৃহী, সন্ন্যাসী নন। তিনি জাত বাউল নন, সখের বাউল। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে বাউল একটি 'ধর্ম-সম্প্রদায়', এই সম্প্রদায়ের সাধকদের 'তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনা-সংবলিত গানই প্রকৃত বাউল গান।' এই বিচারে হরিনাথ নিঃসন্দেহে সখের বাউল। তিনি জানিয়েছেন যে উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশে কয়েকজন সখের বাউলের উদ্ভব হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি নাম কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার এবং পাবনার গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিনাথ 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ' এবং গোলকচন্দ্র 'দীন বাউল'-এর ভনিতায় গান গাইতেন।

হরিনাথ কিংবা দীন বাউলের গানকে বাউলগান শিরোপাভূষিত করতে উপেন্দ্রনাথ স্পষ্টতই আপত্তি করেছেন। সাধারণ্যে এই গানগুলি বাউলগানের সম্মান পাওয়ায় তিনি তাঁর ক্ষোভ গোপন করেন নি। তাঁর এই ক্ষোভ সঙ্গত কি অসঙ্গত সে প্রশ্নে না-গিয়েও বলা যায় যে হরিনাথের তথা ফিকিরচাঁদের বাউলদলের এমন অনেক গান আছে যা প্রকৃত অর্থেই বাউলাঙ্গের। যেমন হরিনাথের একটি গান :

শূন্য ভরে একটি কলস আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর।
কমলের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে সোনার মালিক, কিবা সে উজ্জ্বলঃ
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর।।

এই গানের কথা, কথার পেছনে কথা, রূপকল্প প্রভৃতি নিঃসন্দেহে বাউলগানের পাশে স্থান করে নিতে সক্ষম। এরকম আরও কয়েকটি গান :-

ক) দুনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে, আছে দুই পাখি;
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি। (ভালবাসায়)
এক পাখী কত ফল বিলায়, সে ত খায় না সে ফল, আর এক পাখি বসে বসে খায়,
যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে ভোগী। (ইচ্ছামত)

খ) ডাকে করুণ স্বরে, পাখির হল কি ?
একে, ঘোর রাত্রি, মাঝে নদী, দু'পারে দু'পাখী।। (আছে)
একটি পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়নের জলে, (হায় রে)
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি।। (বল)

গ) দেখ, আসমান জুড়ে আছে আজব পুরুষ এক জনা।
লোকে, যাহা হেরে, যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা।। (ওরে ও ভাই!)
আকাশ তারে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ চিরকালই লেংঠা হয়ে রয়;
সে ত সকল স্থলে, আসমান জলে, নিজে কিন্তু চলে না। (সকল চালায়)

ঘ) আমারে পাগল করে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায়।।
আমি সযতনে, যে রতনে রাখিলাম পুরে হিয়ায়;
আমার ঘুমের ঘোরে, চুরী করে, সে রতন কে নিল হায়।

ঙ) দেখ দেখি ভেবে ভেবে, কেবা রবে,
যে দিনে সে তলব দিবে।
কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে;
বল দেখি চেন ঝুলান, ঘড়ি তোমার, সে দিনেতে কে পরিবে।
কোথা তোর রবে মালা, কোপনী ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে;
তাঁর কাছে ছাপবার জো, নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে।

৩

১৩৫৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'কাঙাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীত' শিরোনামাঙ্কিত আলোচনায় সুশান্ত মজুমদার লিখেছিলেন যে বাউল গানের 'আদি রচয়িতা' বলে যিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন তিনি হলেন 'শ্রীমৎ নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র', তিনিই 'বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা'। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই বীর ভদ্রের নাম ও তাঁর বাউল গান উত্তরকালের বাউল গায়কদের মুখে 'কদাচিৎ' শোনা গিয়েছে। সুশান্তবাবুর মতে কাঙাল হরিনাথই 'বাঙলাদেশে' এই গানের 'বহুল' প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, নৃত্যগোপাল সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাদের আরও দুই ভাই নগেন্দ্রনাথ ও বানোয়ারিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সহায়তায় একটি বাউলের দল গঠিত হয়। কিছুকাল পর ফিকিরচাঁদ নামক জনৈক 'ভ্রাম্যমান ফকির' হরিনাথদের এই বাউলদলে যোগদান

করেন। তাঁর নাম অনুসারেই নাকি এই বাউলদলের নাম রাখা হয় 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল'। সুশান্তবাবু আরও জানিয়েছেন যে এই বাউলদল গঠনের সময় কাঙাল হরিনাথের দৃষ্টি এদিকে 'নিপতিত' ছিল না, তিনি তখন তাঁর 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'র কাজকর্মে এবং বাকি সময় 'সাধনকার্য্যে'ই সময় কাটাতেন, পরে অবশ্য তিনি এই দলের দায়িত্ব 'স্বহস্তে' গ্রহণ করে দলের গানগুলিকে 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ'- এর ভনিতায় অভিহিত ও প্রচার করেন। সুশান্তবাবু জোর দিয়ে যে সব কথা বলেছেন তার সপক্ষে কোন তথ্য প্রমাণ দাখিল করেন নি। তিনি এখানে বাউল গানের কথা বলেছেন কিন্তু লালন ফকিরের নাম উল্লেখ করেন নি। বাউলগানের আদি রচয়িতা হিসাবে তিনি বীরভদ্রের কথা বলেছেন। সুশান্তবাবু সম্ভবত অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য-নির্ভরতায় একথা বলেছেন। বীরভদ্র ছিলেন চৈতন্যের 'সম্প্রদায়'ভুক্ত। তিনি 'চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে' অধিকতর 'স্বাধীন এবং প্রেমানুগ সাধনা'র প্রবর্তন করেছিলেন বলে উল্লেখ করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন 'নাকি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই প্রশ্নে তিনি তাঁর সন্দেহ গোপন করেন নি। বীরভদ্রের 'প্রেমানুগ সাধনার ক্রমবিকাশের পর্যায়ে রামশরণ পাল প্রবর্তন করেছিলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়। আর এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলচাঁদ যার অর্থ দাঁড়ায় বীরভদ্রের প্রেমানুগ সাধনা আউলচাঁদের আদিগুরুত্বে ঘোষপাড়ার রামশরণ পালের নেতৃত্বে বিকাশলাভ করেছিল। মনে রাখা দরকার যে বীরভদ্র ঢাকা শহরে 'বৈষ্ণব ধর্ম' প্রচার করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এমন অনেক বৈষ্ণব ছিলেন যাঁরা বৌদ্ধ থেকে বৈষ্ণব হয়ে মুন্ডিতমস্তক হওয়ার কারণে সাধারণ্যে 'নেড়া' বলে পরিচিত ছিলেন। বীরভদ্র সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক রমাকান্ত চক্রবর্তী বলেছেন যে বীরভদ্র 'এক বিতর্কিত বৈষ্ণব ছিলেন'। শ্রীনিবাসের 'অসাধারণ' ভাগবতপাঠ শুনে বীরভদ্র আনন্দে নৃত্য করেছিলেন এখানে বাউলগানের কথা অনুক্ত থেকে গিয়েছে। সুশান্তবাবু যেভাবে যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে করে এমন ধারণা করার অবকাশ থেকে যায় যে হরিনাথ মজুমদার রামশরণ পালের মতানুসারী হয়ে বীরভদ্রের বাউল গানের ধারায় বাউল গান প্রচার করেছিলেন। এধরনের বক্তব্য প্রমাণসিদ্ধতা ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে ক্ষিতিমোহন সেন তো হরিনাথ মজুমদারকে 'ফিকিরচাঁদ বাউল' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে লালন ফকিরের অনুগামী বলে উল্লেখ করেছেন ।

সুশান্তবাবু আরও বলেছেন যে ফিকিরচাঁদের গানের দল গঠিত হওয়ার সময় হরিনাথ তাঁর পত্রিকা ও 'সাধনকার্য্য' নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' বন্ধ হয়ে যায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে আর কাঙাল ফিকিরচাঁদের গানের দল প্রতিষ্ঠিত হয় ১২৮৭ বঙ্গাব্দের প্রথমদিকে। অর্থাৎ এই তথ্য অনুযায়ী ফিকিরচাঁদের গানের দল গঠিত হওয়ার সাড়ে পাঁচ বছর পরে 'গ্রামবার্তা' বন্ধ হয়ে যায়। এই বিচারে সুশান্তবাবুর

বক্তব্য সাযুজ্য রক্ষা করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বলতে হয় পত্রিকার শেষ তিন বছর অর্থাৎ ১২৮৯ থেকে ১২৯২ বঙ্গাব্দের সমকালীন 'গ্রামবার্তা'র দায়িত্ব ছিল জলধর সেন এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উপর। হরিনাথ এই সময় অনেকখানি ভারমুক্ত ছিলেন। অথচ তিনি ফিকিরচাঁদের গানের দলের প্রতি উদাসীন ছিলেন, এ তথ্য বিশ্বাসকে কন্টকিত করে। আর ফিকিরচাঁদ নামক জনৈক ফকিরের এই গানের দলে যোগদানের কারণে এই দলের নাম ফিকিরচাঁদের গানের দল হিসেবে পরিচিত বা আখ্যায়িত হওয়ার তথ্য হরিনাথের সমসাময়িক কারও প্রদত্ত তথ্যে পাওয়া যায় না। এরকম তথ্য স্বয়ং হরিনাথের বক্তব্যেও মেলে না।

আগেই বলেছি হরিনাথ ছিলেন গৃহী, তিনি কৌপিন-পরিহিত সন্ন্যাসী ছিলেন না। সংসারজগৎ ত্যাগ করে নির্জনে বসে সাধনার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। একটা সময় তিনি সাহসের সঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়ে গ্রামের দরিদ্র, নিপীড়িত, অসহায় প্রজাবর্গের পক্ষে দাঁড়িয়ে অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে, তবু তিনি পথভ্রষ্ট, ব্রতভ্রষ্ট হন নি। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর গানের দল নিয়ে সদলবলে গ্রাম-গ্রামান্তরে মানুষের মধ্যেই গিয়েছেন। সেই সব গানের বাণীতে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বার্তা হয়তো ছিল না কিন্তু তাতে ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা, মানবকল্যাণের কথা, মানুষের হিতসাধনের কথা। সেই সব কথা ও সুরসম্বলিত গান প্রপীড়িত মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, তাই সেসব গান এত জনপ্রিয় হয়েছিল। লালনের গান যে অর্থে বাউল গান, সেই অর্থে হরিনাথের এবং তার দলের অন্যদের গান হয়তো বাউল নয়, তবে বাউলাঙ্গের। লালনের সঙ্গে হরিনাথের সখ্য, তাঁদের মধ্যে মতের আদানপ্রদান, তাঁদের মেলামেশা, মন্দিরে গান গাওয়া, তত্ত্ব আলোচনা ইত্যাদি হরিনাথকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর দলের গায়কদের গৈরিক রঙের আলখাল্লা পরে মুখে নকল দাড়িগোঁফ ও মাথায় পরচুলা লাগিয়ে খঞ্জনি বাজিয়ে খালি পায়ে গান গেয়ে বেড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এতদসত্ত্বেও তাঁরা শেষপর্যন্ত সখের বাউলই থেকেছেন, বাউল জীবনের অনুসারী হন নি। তবে বাংলাদেশের দিকে দিকে ফিকিরচাঁদের গানের খ্যাতি ছিল অপ্রতিরোধ্য।

৪

হরিনাথ নিজে গান লিখেছেন, অন্যদেরও গান লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফিকিরচাঁদের গানের দলের প্রথম গানটি রচনা করেছিলেন, আগেই উল্লেখ করেছি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ; দ্বিতীয় গানটি রচনা করেছিলেন স্বয়ং হরিনাথ মজুমদার; তৃতীয় গানটি রচনা করেছিলেন প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই দলে গান লেখার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। নিত্যনতুন গান রচনা ও গাওয়া হচ্ছিল। দলের সদস্য না হলে তাঁর বাড়ি গান গাইতে গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না এমন কথা হরিনাথের মুখে শুনে মীর মশার্‌রফ হোসেনও নিজেকে ফিকিরচাঁদের দলভুক্ত করে গান

লিখেছিলেনঃ 'রবে না দিন চিরদিন, সুদিন, কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে'। এভাবে নতুন নতুন গানে সমৃদ্ধ হয়ে ফিকিরচাঁদের গানের দল নিয়ে হরিনাথ গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গণমানুষের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছেন, তাঁদের বিমুগ্ধ বিমোহিত করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। হরিনাথের দলের গান শুনতে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হতেন। এই সব গানের মধ্যে কোন ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিলনা, সাম্প্রদায়িক নির্যাস ছিল না, কোনরকম ভেদবুদ্ধির এতটুকু উপাদান ছিল না। তাঁর দলের গান শুনতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ সমবেত হতেন। এমনকি ব্রাহ্ম ও হিন্দুদের মধ্য বিবাদের নিষ্পত্তি করতে হরিনাথ তাঁর গানের দলকে সফলভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। লালন জীবনীকার বসন্তকুমার পাল তো হরিনাথকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> হরিনাথ ধনীদের বাড়ির পাশে জন্মগ্রহণ করেও রায়বাহাদুর, নাইট ইত্যাকার সরকারি খেতাব প্রাপ্তির অভিলাষ না-রেখে 'স্বতঃপ্রবৃত্ত' হয়ে 'কাঙাল' উপাধি গ্রহণ করে 'ফিকিরচাঁদের অপূর্ব্ব রাগিনীর নিরাবিল তরঙ্গে' বাংলাদেশের গ্রাম-শহর মুখরিত করেছিলেন।

একবার কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেতে ব্যর্থ হওয়ায় হরিনাথ কলকাতা শহরকে 'বড় মানুষের' শহর বলে অভিহিত করে 'বহুকাল' আর এই শহরে যান নি। নিজে ব্রাহ্ম না-হওয়া সত্ত্বেও হরিনাথ তাঁর সুহৃদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরোধ রক্ষা করতে সদলবলে কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের মাঘোৎসবে গান গেয়েছেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১০ ও ১১ মাঘ যখন হরিনাথ কলকাতায় সদলবলে গান গাইছেন তখনও তাঁর 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায় নি। হরিনাথ ফিকিরচাঁদের দলের গান শুনতে কলকাতা শহরেও ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল। সেবার কলকাতায় হরিনাথ দু'তিন দিন থাকার সূত্রে ব্রাহ্মনেতা কেশব-অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুদারের বাড়িতেও গান গেয়েছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১২৯২ বঙ্গাব্দেও বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করতে হরিনাথ সদলবলে ঢাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে ফিকিরচাঁদের দলের গান শুনে ঢাকা শহর এমনই 'মত্ত' হয়ে উঠেছিল যে হরিনাথকে অনুরোধ রক্ষা করতে আহ্বানকারীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করতে হয়েছিল। পরের বছরও হরিনাথ বিজয়কৃষ্ণের আহ্বানে আবার সদলবলে ঢাকায় যান। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় ঃ 'কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের (হরিনাথ মজুমদার ও প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায়ের) গান' বাংলাদেশের 'সর্ব্বত্রই' ছড়িয়ে পড়েছে, সব জায়গাতেই এঁদের কথা আলোচিত হয়, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এঁদের গান জনপ্রিয়। পরের বছর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত 'সারস্বত উৎসব'-এ আবারও বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধে হরিনাথ সদলবলে গিয়ে গান গেয়ে নগরবাসীকে 'উন্মত্ত' করে তুলেছিলেন। হরিনাথের অকৃত্রিম সুহৃদ বিজয়কৃষ্ণ জানিয়েছেন যে তিনি নিজে বহুবার প্রত্যন্ত গ্রামের 'মাঝিমাল্লা ও সাধারণ লোকের মুখেও' হরিনাথের গান শুনেছেন।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এক আলোচনায় রমেশ বসু বাংলা সাহিত্যে বাউল গানের প্রভাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, উনিশ শতকের বাঙালি মিস্টিকদের মধ্যে 'হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল ফিকিরচাঁদের স্থান খুব' বৈশিষ্ট্যপুর্ণ। তিনি তত্ত্বপ্রধান বাউল সংগীতের মধ্যে হরিনাথের 'তত্ত্বমুলক বাউল সঙ্গীতগুলিতেও' বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। হরিনাথের আরও কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি তাঁর গানের গুরুত্বপুর্ণ উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে,

ক) আজব দুনিয়ার একি, আজব কারখানা
ফল খেয়ে ঘোরে যে গাছ দেখেনা।

খ) সব হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক খেয়ায়
একি চমৎকার কেহ কার, ছোয়া পানী নাহি খায়।
এক খেয়ারি ভুলিয়ে নৌকায়, সকল জেতের পারে লয়ে যায়;
এক আকার, সবাকার, তবু জাত বিচার দেখায়।।

গ) ওহে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে তোমারে
(ওহে দীনদয়াল)

ঘ) ভোলা মন কি করিতে কি করিলি
সুধা বলে গরল খেলি
সংসারে সোনার খনি পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি;
কি বলে অবহেলে, সোনা ফেলে, আঁচলে কাচ বেঁধে নিলি।

ঙ) অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদালে নির্জ্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্যশশী।

চ) এত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধরতে নাই, দুটি হাত বাড়ালে।।
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকারে ঘর কারাগারে, হায় রে;
তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।।

তবে এই ধরনের গানরচনার পাশাপাশি হরিনাথ সমসময়ের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যকেও তাঁর ফিরিকচাঁদের দলের গান হিসেবে পরিবেশন করেছিলেন। 'ভারতবন্ধু' ফসেট, রানি ভিক্টোরিয়া, লর্ড রিপন, মহারানি স্বর্ণময়ী, এদেশে বৃটিশ শাসনের মঙ্গলকামনা প্রভৃতি তার বাউলাঙ্গের গানের

বিষয়বস্তু হয়েছিল। হরিনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ও ভাবাদর্শের অগভীরতা ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলনসঞ্জাত এইসব গান তার আবেদনময়তার সীমাক্ষেত্র রচনা করেছে। ফসেটের মৃত্যুত্তর শোকসভায় কুমারখালিতে হরিনাথ দু'টি গান লিখে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং পরে তা মিসেস ফসেটের কাছে পাঠানো হয়েছিল। গানদু'টির মধ্যে একটি এইরকম,

হায়রে, আজ এক শুনি শ্রবণে;
সেই যে দয়ার সিন্ধু, ভারতবন্ধু, ফসেট নাই আর ভুবনে।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর ফসেট প্রয়াত হন। এর অব্যহিত পরে হরিনাথ এই গানটি লেখেন। এর কয়েক সপ্তাহ পর, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে লর্ড রিপন ভারত ত্যাগ করেন তাঁর স্বদেশে ফিরে যাওয়ার সংবাদে হরিনাথ প্রচন্ড মানসিক আঘাত পান। রিপনের বিদায় উপলক্ষে হরিনাথ একটি দীর্ঘ গান লিখে পোড়াদহ স্টেশনে সদলবলে সেই গান গেয়ে রিপনের বিসদৃশ প্রশস্তি করেছিলেন। গানটির কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করছি ,

১। দেশে চলিলেন মহামতি রিপণ।
রামরাজ্য-সম প্রজা করিয়ে পালন।
সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি)
তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

লর্ড রিপনের ভারতত্যাগ সমসময়ে শুধুমাত্র হরিনাথ নয়, অনেকেকই মনোবেদনা দিয়েছিল। মনোমোহন বসুও সেই সময় আশিজন বাউল নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে 'লর্ড রিপনের গুণকীর্তন' করেছিলেন। তিনি ছাড়াও রিপনের ভারতত্যাগে সে সময় 'আত্মীয় বিয়োগব্যথা' অনুভব করেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আনন্দমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এছাড়াও হরিনাথ সমসময়ের বেশ কিছু সামাজিক ঘটনার বিরুদ্ধে খেদ প্রকাশ করতে কিছু গান লিখেছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতা ও কবিতা-প্রবন্ধ রচনার প্রেরণাদাতা গুরু কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সমকালের স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবিদের মদ্যপানাসক্তিকে হরিনাথ নিন্দা না-করে পারেন নি। এই নিন্দাকর্মকে তিনি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মদ খেয়ে উচ্ছন্নে যায়নি এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, 'কত শত সুচারু শরীর রূপবান যুবা' মদ্যপানের ফলে 'চিররুগ্ন' হয়েছেন, তাঁদের মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র সহ পরিবারের

আত্মজনদের 'শোকাকুল' করে 'মৃত্যুমুখে পতিত' হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এই অবস্থান থেকে তিনি তাঁর 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত'-এর ১৮০ সংখ্যক গানে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন,

হায় রে তোদের হাতে ধরি কাতরে করি রে মানা।
তোমরা কেউ সুধা বলে হাতে তুলে, সুরা বলে গরল পান কর না রে।
(হাতে তুলে)

১। মদ্য হয় কালভুজঙ্গ, ওরে যে করে তাহার সঙ্গ,
হায়রে তার ধন সাজ জীবন রহে না;
ঐ যে গরল পানে মলো প্রাণে, আর ত উঠে বসিল না রে।।
(সোনার হরিশ)

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন 'ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গশশী, তারে খেল ঐ রাক্ষসী'। কবি মধুসূদন সম্পর্কে লিখেছেন, 'কবিবর মধুসূদন, ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন' সেও 'গরল খেলো ঢলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে'। আর এই সব কথা বলার পর তিনি সখেদে কেঁদেছেন,

কাঙাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গমাতা রাখ তাঁর কথা
ওরে ভাই
আপন মাথা আপনি খেয়ো না;
ওরে কাঁদিতে তার জনম গেল, মাকে আর ভাই কাঁদাও নারে
(তোদের পায়ে ধরি)।।

কাঙাল হরিনাথের এই খেদ ও কান্না এবং এই মদ্যপান নিবারণে তাঁর এই আহ্বান বাস্তবিক আন্তরিক। তাঁর বাউলাঙ্গের এই গান মর্মস্পর্শী। এই গান সমসময়ে যথেষ্ট জনাদরলাভ করেছিল। সামাজিক দায়বদ্ধ এই হরিনাথ আবার যখন তাঁর রাজভক্তি প্রদর্শনের পর্যায়ে ফসেট বা রিপন স্তুতিকে গীতরচনার অঙ্গ করে তাতে সুর দিয়ে সদলবলে গান গেয়ে বেড়ান তখন তা যতটা বিসদৃশ ঠেকে তার চাইতে তার শিল্পমূল্য বেশি প্রশ্নাকুল হয়।

৫

আগেই বলেছি হরিনাথ বাউল জীবন যাপন করেননি, বাউল জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষীও ছিলেন না। তিনি রীতিমত গৃহী, সংসারী। তবে গ্রামের হতদরিদ্র প্রপীড়িত মানুষদের স্বার্থরক্ষার্থে তিনি অত্যাচারী জমিদারদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁর পত্রিকা 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'কে হাতিয়ার করেই। এই মহতী কাজে সময় দিতে গিয়ে তিনি হয়ত সবসময় তাঁর সংসারের প্রতি দায়-দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করতে পারতেন না, কিন্তু তাবলে তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ী কখনও তাঁর প্রতি অভিযোগ করেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় না, বরং হরিনাথের এই সংগ্রামের প্রতি স্বর্ণময়ী তাঁর অনুচ্চকিত সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রকৃত অর্থে তাঁর সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন। সাহসী সাংবাদিকতা করতে গিয়ে, জীবন বিপন্ন করার ঝুঁকি নিয়েও

হরিনাথ তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবারাদি ফেলে পালিয়ে অন্য আশ্রয়স্থল সন্ধানের প্রয়াসী হন নি। আবার উত্তরকালে ফিকিরচাঁদের বাউলদল গঠন করে গ্রাম-গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়ানোর পর্যায়েও তিনি বিবাগি হওয়ার চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন নি। তিনি গৃহী হিসাবেই বাউলগানের চর্চা করেছেন। এই অর্থে তিনি অবশ্যই শখের বাউল। তবে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সখের বাউল শব্দদ্বয়ে যে উন্নাসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন হরিনাথের ফিকিরচাঁদের বাউলগানের মধ্যে, ভাব ও দর্শনের নিরিখে, তার সমর্থন মেলে না। জাঁ ওপেনশ তাঁর 'সিকিং বাউলস অব বেঙ্গল' গ্রন্থে (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ) 'সখের বাউল' বা অ্যামেচার বাউল শব্দদ্বয়কে অবমাননাকর ('ডেরোগেটরি') বলে চিহ্নিত করেছেন। শোনা যায় হরু ঠাকুর প্রথমে একটি 'সখের দল' বা 'অ্যামেচার গ্রুপ' তৈরি করে গান গাইতে গিয়ে অপমানিত হন, পরে তিনি নিজে 'পেশাদারি' দল গঠন করেছিলেন। বাউলের দলের গানের বিপ্রতীপে, বাউলের জীবনচর্যা ব্যতিরেকে, নিছক সখের বশে 'তথাকথিত' বাউল গান গাওয়ার বিষয়টিকে সখের বাউল বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতার মধ্যে মর্যাদাহানিকর বিষয়টি থেকে যায়। উত্তরকালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাউলাঙ্গের গান রচনা করেছেন, বাউলের সাজে গেয়েছেন। তখন তার জন্য নতুন শব্দ হিসেবে 'রবীন্দ্র বাউল' কীর্তিত হয়েছে। হরিনাথের গানের প্রভাব কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, রজনীকান্ত সেন এমনকি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানে লক্ষ্য করা যায়। এঁরা কেউই যৌথগানের সমন্বয়ে গানের দল গড়ে গ্রামগঞ্জে সদলবলে গান গাইতে যান নি। কিন্তু হরিনাথ অনেকের রচিত গানের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর ফিকিরচাঁদের বাউল দল নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে সদলবলে গাইতে গিয়েছেন এবং মানুষের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিক দিয়ে হরিনাথকে কাঙাল বাউল বলা বোধহয় অসমীচীন নয়।

একথা সত্য যে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে বাংলাভাষায় যে সব নাগরিক কাব্য-কবিতার প্রস্ফুটন ঘটেছিল তারই অনুষঙ্গে বাউলের রহস্যগন্ধী একটি সৃজন সাহিত্যের ধারাও বিকাশমান পর্যায়ে থেকে গিয়েছিল যদিও সবসময়ে তা আশানুরূপ জনাদরগ্রাহ্য হয়নি। স্বভাবতই এর সলজ্জ প্রকাশ জনসাহিত্যের প্রাঙ্গনে গন্ধবাহিতায় বার্তাবহ হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তবু 'বাউল-প্রভাবিত' গীতিসাহিত্যের এই ধারাটি বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙালি কবিদের মনোজগতে একটা অনতিস্পষ্ট রেখাপাতও ঘটিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে যাঁরা এই 'বাউল প্রভাবিত' গীতিসাহিত্য রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাঁরা ইংরাজি-বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কোনও না কোনটিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এঁরা যে কেন বাউলাঙ্গের গীতিকবিতা রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। এঁরা কেউ 'বৈরাগী' বা 'বিবাগি' ছিলেন না, সহজিয়া পথের পথিকও ছিলেন না। এঁদের বাউলেপনা ছিল নিতান্তই 'সখের' বিষয়। সংসারজীবন থেকে

জীবনসংগ্রামের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় নানারকম ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থেকে বাউলদের দর্শন ও জীবনচর্যায় শরিক না-হয়েও এঁরা বাউলাঙ্গের গীতিকবিতা রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর এদিক থেকে 'ঊনবিংশ শতাব্দির নবজাগ্রত কর্ম্মরত বাঙালী জীবনের জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে বাউলের এই দূর হতে ভেসে আসা নিশীথ রাতের উপযুক্ত কাঁপানো সুরটি আজ আমাদের কাছে যেন খাপছাড়া ঠেকে।'

শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হওয়ায়, প্রকৃত অর্থে অভিভাবকহীন, হরিনাথ মজুমদার প্রথাগত শিক্ষার অনধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বচেষ্টায় বাংলাভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট তিনি সংস্কৃতশিক্ষা করেছিলেন। তিনি ইংরেজি জানতেন না। স্বভাবতই বাউল-প্রভাবিত গীতিসাহিত্য রচনাপ্রয়াসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত কবিদের মধ্যে হরিনাথকে অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ আত্মসুখপরায়ণতার একান্তই অপক্ষপাতী হরিনাথ জীবনকে অন্যভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের চোখে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া, তাঁদের সুরুচিসম্পন্ন করে তোলার সামাজিক দায়জ অভিপ্রায়ে তিনি নাটক-পাঁচালি, কবিগান-উপন্যাস রচনা করেছেন, অভিনয় করিয়েছেন, পাঠচক্র গড়ে তুলেছেন, 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকার' মাধ্যমে প্রপীড়িত মানুষজনের দুঃখ-দুর্দশার নিরসন করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং শেষপর্যায়ে বাউলগান লিখে ও সদলবলে তা গেয়ে গ্রাম-গঞ্জের মানুষের মনের দরবারে হাজির হওয়ার প্রয়াসে ব্রতবদ্ধ থেকেছেন। তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা প্রতিনিয়ত মানবকল্যাণের পথান্বেষণে ক্লান্তিহীন থেকেছে। এই অন্বেষা যখন তাঁকে বাউলমনা করে সাধনক্ষেত্রে নিয়ে আসে তখন তাতে আর যাই হোক ফাঁকি থাকে না। আন্তরিক অর্থে বাউল জীবনদর্শনের সঙ্গে একাত্মতা না ঘটলেও হরিনাথের বাউলমনা এবং সাধনক্ষেত্রের সম্মিলনের ফলশ্রুতিতে যে গীতিকার ও গায়ক হরিনাথকে আমরা পাই তাকে উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'সখের' বাউল অভিধা দেওয়া কতখানি সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রখ্যাত সমালোচক সুরেশচন্দ্র মৈত্র হরিনাথের ফিকিরচাঁদের গানের দলের গানকে 'কৃত্রিম বাউল' গান বলার প্রবণতাকে মান্যতা দেন নি। তাঁর মতে হরিনাথের 'গান' ও তার 'শব্দসম্ভার' তাঁকে কেন্দ্র করেই 'শিক্ষিত সমাজে প্রবেশাধিকার' পেয়েছিল। রমাকান্ত চক্রবর্তীও হরিনাথকে 'অসাধারণ ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনাথকৃষ্ণ দেবও হরিনাথ ও তাঁর ফিকিরচাঁদের গানের দলের গানকে আন্তরিকভাবেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। হরিনাথ যখন গান,

বাহিরে তিলক ঝোলা জপের মালা দেখে ত ভাই সে ভুলবে না।
বাহিরে মোড়া মাথা ছেঁড়া কাঁথা মনের মধ্যে কু বাসনা।।
তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা করে বেড়াও আসন ঠিক থাকে না।।
কাঙাল কয় কু বাসনা মনের মধ্যে থাকলে না হয় উপাসনা।।

তখন এর মধ্যে কৃত্রিমতার অবকাশ কোথায়? উন্নাসিকের সখের বাউলেপনা এখানে দুর্নিরীক্ষ। হরিনাথের 'যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে' গানের মধ্যে 'প্রাণের কাঁদুনি' খুঁজে পেয়ে অনাথকৃষ্ণ দেব তো বিমোহিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে উনিশ শতকের শেষলগ্নে 'টপ্পা-খেউড় ফুর্তি-প্লাবিত' বাংলাদেশে হরিনাথের গান দীর্ঘশ্বাসের সীমাক্ষেত্র অতিক্রম করে 'একটু আরাম-একটু শান্তি'র সন্ধান দিত। আজ থেকে সত্তর বছর আগে সুশান্ত মজুমদার কাব্যনিধি বলেছিলেন যে বাংলাভাষার কবিরা যেমন বাংলাসাহিত্যকে ফল-ফুল ও 'শাখা-প্রশাখায় সুশোভিত' করে গিয়েছেন কাঙাল হরিনাথও তেমনি তাঁর 'বাউল সংগীতের মধ্য দিয়া' বাংলা সাহিত্যকে 'স্রোতস্বতী কল্লোলিনীর' মতো 'উত্তাল তরঙ্গমালায় উদবেলিত' করে সবেগে প্রবাহিত করে গিয়েছেন। হরিনাথের গানের সমঝদার সুপন্ডিত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগে 'দেশ' পত্রিকার ৪ এপ্রিল (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় লিখেছিলেন যে হরিনাথের গান 'আজকাল' আর বড়ো শোনা যায় না, কলকাতার মতো শহরে 'এ ধরনের গানের প্রচার কম'। হরিনাথকে তিনি সরাসরি 'বাউল' আখ্যায় আখ্যায়িত করেই লিখেছিলেন যে তাঁর মতো 'জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের' এমন ত্রিযোগবিশিষ্ট মানুষ 'আমাদের দেশে বিরল'। আচার্য সুকুমার সেনও হরিনাথের গানকে 'বাউল গান' হিসেবেই আখ্যাত করে বলেছেন হরিনাথ 'কাঙাল' এবং 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতায় তাঁর বাউল গানে 'দেশ' মাতিয়েছিলেন।

৬

হরিনাথের গানের প্রকৃত সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নি। তাঁর প্রকাশিত গীতাবলী এবং হরিনাথ গ্রন্থাবলীতে সংকলিত গান ছাড়াও হরিনাথের কুমারখালির বসতবাড়িতে অর্থাৎ কাঙাল কুটীরে চার শতাধিক অপ্রকাশিত গানের পান্ডুলিপি আছে বলে কাঙাল প্রপৌত্র অশোক মজুমদার (কিছুকাল আগে প্রয়াত হয়েছেন) লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছিলেন। প্রকাশিত গীতাবলী ছাড়াও 'কাঙ্গালের ব্রহ্মান্ডবেদ'-এও অনেক গান সংকলিত হয়েছে। অবশ্য এই সব গানই যে হরিনাথের, তা নয়। ব্রহ্মাণ্ডবাদের বারোটি সংখ্যার ১৬৮ টি গান, দ্বিতীয় ভাগে ১১১ টি গান এবং চতুর্থ ভাগে ৪৩ টি গান সংকলিত হয়েছে। এই সংকলিত গানগুলির মধ্যে হরিনাথ ছাড়া আর যাঁদের গান আছে তাঁরা হলেন প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দানবারি গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, লালন ফকির, নীলকণ্ঠ মজুমদার, ডাক্তার শ্যামাচরণ মজুমদার, রামলাল চৌধুরী, ত্রৈলোক্য, পুণ্ডরিক এবং 'নাম অজ্ঞাত'-এর গানসমূহ। নিজের গান ছাড়া অন্যের সংকলিত গানের নিচে হরিনাথ সেই গানের গীতিকারের নাম স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত করে প্রশ্নাতীত সততার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্যের গান তিনি কখনও নিজের বলে দাবি করেন নি। বরং অন্যের গানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। পাগলা কানাইয়ের গান শুনে যে সমসময়ে মানুষ 'পাগল হইয়া যায়' সেকথা তিনি

স্বয়ং বলে গিয়েছেন।

'কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী' মোট বারো পৃষ্ঠার পুস্তিকা হিসাবে ষোলটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম বারোটি খন্ড একত্রে প্রকাশিত হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। অবশিষ্ট চারটি খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। এবং এই একই শিরোনামায় গ্রন্থটি একখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩১০ বঙ্গাব্দের পৌষ-মাঘ মাস নাগাদ)। 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীত' প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে। এই গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে জলধর সেন লিখেছিলেন যে কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীতের 'কতকগুলি সঙ্গীত' পুস্তককারে প্রকাশ করার ইচ্ছে তাঁর অনেক দিন থেকেই ছিল, কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছে ফলবতী হচ্ছিল না। অবশেষে বর্ধমানাধিপতি 'শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর'-এর অর্থানুকুল্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। জলধর সেন জানিয়েছিলেন যে কাঙালের 'অসংখ্য' গানের মধ্যে থেকে 'কয়েকটিই' এই সংকলনে তিনি একত্র করেছিলেন, ভবিষ্যতে 'কখনও সময়' হলে তিনি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করবেন। তবে এই দ্বিতীয় খণ্ড আর কখনও প্রকাশিত হয় নি। আজ থেকে আট বছর আগে কাঙালপৌত্র বৈদ্যনাথ মজুমদার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন গত ১৪১৫ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (মে ৮, ২০০৮)। এছাড়া 'কাঙালসঙ্গীত' শিরোনামায় হরিনাথের আরও একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এই পুস্তিকার প্রকাশক ছিলেন কাঙালপুত্র সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই পুস্তিকার মোট চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে আঠারো পৃষ্ঠা জুড়ে আছে 'ভাবোচ্ছ্বাস'-এর গান। সেই গানগুলি বাদ দিলে এই সংকলনে মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩১ টি। এই 'কাঙাল সঙ্গীত'-এর প্রথম গানটির কয়েকটি পংক্তি এরকম,

এই ত মানব-জীবন ভাই। এই আছে আর,- এই নাই
যেমন পদ্মপাত্রে, জল টোলে সদাই;-
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই।
আজ গেল আবার পরে যাবে কেহ;-
অনিত্য এই মানব দেহ।
তবে কেন অহঙ্কারে বল মত্ত সদাই।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন যে ঈশ্বর ভূত গভীর রাত্রে 'লালন সাঁই বা ফিকিরচাঁদের (মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ) গান গাইত তার বেসুরো মোটা গলায়...' হরিনাথের গানের পরিচিতির ব্যাপকতার একটা নিদর্শন এটাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকতে পারে যে রবীন্দ্র-পরিবারে জনৈক 'বঙ্কম' কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শোনাতেন। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক বঙ্কিমচন্দ্র সেনও তাঁর বাড়িতে তাঁর পিতার সাক্ষাৎপ্রার্থী এক 'গৌরবর্ণ গৈরিকধারী সন্নাসী'র মুখেও

হরিনাথের 'কে তরে ঢালিয়া দিল এমন শীতল জল রে' এবং 'এই কি সেই আর্যভূমি' গানদুটি শুনেছিলেন। গঙ্গোত্রীর পথে জলধর সেনের কাছে এক স্বামীজী 'হরিনাথ মজুমদারের হিমালয়ের গান' শুনতে চেয়েছিলেন। জলধর সেনও 'হৃদয় খুলিয়া' হরিনাথের এই গানটি গেয়েছিলেন :

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে,-
কেবা রে আদর কোরে, তোমার শিরে, সহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে;
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমার হীরার টোপর পরায়েছে।

এই গান গাইবার সময় স্বয়ং স্বামীজীও জলধরের সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন।- এইসব তথ্য আসলে হরিনাথ মজুমদার তথা ফিকিরচাঁদের দলের গানের জনপ্রিয়তারই পরিচয়বাহক। হরিনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার হরিনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, কামনার আসক্তি' থেকে 'ক্ষুদ্র' মানব হৃদয়কে রক্ষা করার পন্থা হিসেবে হরিনাথের গান 'অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ' ; ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহি, রংপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানের 'অনেক লোকই' হরিনাথকে 'দেবতার ন্যায় ভক্তি' করতেন। সতীশচন্দ্রের এই বক্তব্যে কিছুটা অতিশয়তা থাকলেও হরিনাথের জনগ্রাহ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

হরিনাথের ফিকিরচাঁদ নামের অনুসরণে সমসময়ের বাংলাদেশে দয়ালচাঁদ, আজবচাঁদ, গরিবচাঁদ প্রভৃতি নামাঙ্কিত গানের দলের উদ্ভব হয়েছিল। কোন কোন সময় হরিনাথের দলের গান লালন এবং পাগলা কানাইয়ের জনপ্রিয়তাকেও ছাপিয়ে উঠতো। মির মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী'-র উননব্বই সংখ্যক গানে এর পরিচয় মেলে। হরিনাথের মৃত্যুর পরবর্তীতে 'বাঙালীর গান' সম্পাদনার সময় দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছিলেন যে হরিনাথ তথা ফিকিরচাঁদের দলের 'কাঙাল ভণিতাযুক্ত' অনেক গান পূর্ব্ববাংলার বিভিন্ন 'নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে' গাওয়া হয়ে থাকে। 'পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সঙ্গীতকার' হিসেবে 'প্রসিদ্ধ' এই কাঙাল হরিনাথের ছত্রিশটি গান দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর 'বাঙ্গালীর গান'-এ সংকলিত করেছিলেন।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ বৈশাখ (এপ্রিল ১৬, ১৮৯৬) অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক একশ কুড়ি বছর আগে হরিনাথ প্রয়াত হওয়ার পরবর্তীতে শিলং থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সেবক' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

ফিকিরচাঁদ ফকিরের পারমার্থিক বাউলসঙ্গীত কে না শুনিয়াছেন? সাধক রামপ্রসাদের গীতাবলির ন্যায় এই গানগুলিও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আবাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হরিনাথ আধুনিক সঙ্গীত রচয়িতাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান।

আবেগের আতিশয্য সত্ত্বেও কাঙাল বাউলের পরিচিতি, সাফল্য ও জনগ্রাহ্যতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে কথাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।